

জাতিসংঘের 'আরটুপি' তত্ত্ব কি মিয়ানমারে প্রয়োগযোগ্য নয়?

ড. তারেক শামসুর রেহমান।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ছাত্ররা 'আরটুপি' (R2P) তত্ত্ব সম্পর্কে কিছুটা ধারণা রাখেন। যেখানে মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটিত হয়েছে, নিরস্ত্র জনগোষ্ঠীর ওপর অত্যাচার-নিপীড়ন চালানো হয়েছে, সেখানে প্রয়োগ করা হয়েছে 'রেসপনসিবিলিটি টু প্রোটেক্ট' (আরটুপি) তত্ত্ব। লিবিয়ায় ২০১১ সালের ১৭ মার্চ যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটোর বিমানবাহিনী একসঙ্গে বিমান হামলা চালিয়ে তৎকালীন শাসক মুয়াম্মার গাদ্দাফিকে উৎখাত করেছিল। সেখানে প্রয়োগ করা হয়েছিল আরটুপি তত্ত্ব, অর্থাৎ 'মানবিকতা রক্ষায় হস্তক্ষেপ'! অভিযোগ ছিল- গাদ্দাফি সরকার সাধারণ মানুষদের হত্যা করছে, নিরপরাধ মানুষদের রক্ষা করতে পারছে না! তখন 'আরব বসন্ত' তুঙ্গে। একে একে পতন ঘটছিল জাইন বেন আলী ও হোসনি মুবারকের মতো স্বৈরশাসকদের। সবার দৃষ্টি তখন ছিল গাদ্দাফির দিকে। এর আগে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ তাদের এক প্রতিবেদনে বলেছিল, লিবিয়ায় প্রায় তিন হাজার সাধারণ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। আর এর বেশ ধরেই গাদ্দাফিকে উৎখাতের সিদ্ধান্ত নিল যুক্তরাষ্ট্র। প্রয়োগ করল আরটুপি তত্ত্ব।

'আরটুপি' তত্ত্ব মূলত জাতিসংঘ কর্তৃক উদ্ভাবিত ও অনুমোদিত। ২০০৫ সালে জাতিসংঘ আয়োজিত বিশ্ব সম্মেলনে এ তত্ত্ব গ্রহণ করা হয়। এই তত্ত্বের মূল কথা হচ্ছে, একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের নিরীহ জনগণকে গণহত্যা থেকে রক্ষা করা এবং তাদের মানবাধিকার নিশ্চিত করা। সাধারণ ক্ষেত্রে আরটুপি তত্ত্ব সামরিক অভিযান কিংবা বিমান হামলার মধ্য দিয়ে বাস্তবায়ন করা হয় (লিবিয়া, সিরিয়া, সুদান)। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিবদমান গ্রুপগুলোর মধ্যে সমঝোতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি কমিশন গঠন করে সেখানে নিরপরাধ মানুষদের হত্যার হাত থেকে রক্ষা করা হয় (কেনিয়া, ২০০৮)। আরটুপি'র ১৩৮ অনুচ্ছেদে বলা আছে, একটি স্বাধীন রাষ্ট্র তার জনগণকে সব ধরনের গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ, জাতিগত উচ্ছেদ অভিযান থেকে রক্ষা করবে। এ ধরনের অপরাধ যাতে না ঘটে তা দেখার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। আর আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ওই রাষ্ট্রকে সহযোগিতা করবে এই দায়িত্ব পালন করতে। আরটুপি'র ১৩৯ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় জাতিসংঘের মাধ্যমে গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ, জাতিগত উচ্ছেদ অভিযান, মানবতাবিরোধী অপরাধ বন্ধে কূটনৈতিক, মানবিক উদ্যোগসহ প্রয়োজনীয় সব উদ্যোগ গ্রহণ করবে। উদ্দেশ্য জনগণকে গণহত্যা থেকে রক্ষা করা।

আরটুপি তত্ত্বের সঙ্গে Humanitarian Intervention-এর প্রশ্নটিও জড়িত। এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, মানবিকতা রক্ষার নামে যে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ সমর্থনযোগ্য। তবে আরটুপি তত্ত্বের প্রয়োগ নিয়েও কথা আছে। লিবিয়া ও সিরিয়ায় এ তত্ত্বের প্রয়োগ হয়েছে। এক্ষেত্রে বৃহৎ রাষ্ট্র অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র এবং সেই সঙ্গে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের স্বার্থ ছিল। আরটুপি তত্ত্বের প্রয়োগের ক্ষেত্রে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সমর্থন দরকার। এই তিন শক্তি লিবিয়ায় বিমান হামলাকে সমর্থন করেছিল। এমনকি সিরিয়ায় আইএস ঘাঁটিতে বিমান হামলার ব্যাপারেও নিরাপত্তা পরিষদ সমর্থন দিয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিতে আরটুপি তত্ত্ব লিবিয়ায় 'সফল' হয়েছে। কিন্তু সিরিয়ায় সফল হয়নি। গাজায় ইসরাইলি হামলায় যখন কয়েক হাজার শিশু (ফিলিস্তিনি) প্রাণ হারিয়েছিল, তখন আরটুপি তত্ত্ব আদৌ প্রয়োগ করা হয়নি। যুক্তরাষ্ট্র কখনও ইসরাইলের বিরুদ্ধে কোনো অভিযান পরিচালনা করেনি এবং আগামীতেও করবে না। আবার লিবিয়ায় এই তত্ত্ব সফল হয়েছে দাবি করা হলেও সে দেশে ভয়াবহ জঙ্গিবাদের উত্থান ঘটেছে এবং দেশটি কার্যত তিনভাগে ভাগ হয়ে গেছে। সেখানে এখন কোনো কেন্দ্রীয় সরকার নেই। সিরিয়ায় মার্কিন বিমান হামলায় আইএস কিছুটা দুর্বল হয়েছে সত্য। কিন্তু সিরিয়া একটি ধ্বংসের নগরীতে পরিণত হয়েছে। এবং ২০১৭ সাল শেষ হতে চলল; কিন্তু আইএসকে পুরোপুরি উৎখাত করা সম্ভব হয়নি। কেনিয়ায় আরটুপি তত্ত্ব প্রয়োগ হয়েছিল অন্যভাবে। ২০০৭ সালের ডিসেম্বরে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সেখানে বড় ধরনের সহিংসতার জন্ম হয়েছিল। ওই নির্বাচন কার্যত দেশটিকে দুটি বড় দল- অরেঞ্জ ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট (ওডিএম) এবং পার্টি অব ন্যাশনাল ইউনিটির (পিএনইউ) মধ্যে ভাগ করে দেয়। দল দুটি বড় দুটি উপজাতির প্রতিনিধিত্ব করত। নির্বাচনে পিএনইউ'র মওয়াই কিবাকিকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়, যা উসকে দেয় বড় ধরনের সহিংসতাকে। পরবর্তী সময়ে জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব কফি আনানের মধ্যস্থতায় একটি সমঝোতা হয় এবং একটি কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। ওডিস্সা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হন, যদিও সংবিধানে প্রধানমন্ত্রীর কোনো পদ ছিল না। এটি একটি আরটুপি'র উদ্যোগ ছিল, অর্থাৎ মধ্যস্থতা (জাতিসংঘ কর্তৃক) ও সমঝোতা। ওই সহিংসতায় একদিকে কিকুউস (Kikuyus) ও অন্যদিকে কালেনজিন্স (Kalenjins) উপজাতি পরস্পরের বিরুদ্ধে সহিংসতায় লিপ্ত হয়েছিল। সেই সমঝোতা কিছুদিনের জন্য কাজ করেছিল। কিন্তু পরে তা ভেঙে যায়। তবে আগের মতো সহিংস ঘটনা আর ঘটেনি।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যেখানে যেখানে মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটিত হয়েছে- সব ক্ষেত্রেই ওই আরটুপি তত্ত্ব প্রয়োগ করা হয়েছে কিনা? এর জবাব হচ্ছে, না, সব জায়গায় এই তত্ত্ব প্রয়োগ করা হয়নি। যেখানে বৃহৎ শক্তিগুলোর স্বার্থ রয়েছে, সেখানেই এই তত্ত্ব প্রয়োগ করা হয়েছে। পাঠক, সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করলে দেখবেন- বসনিয়া-হারজেগোভিনা, লিবিয়া, সুদান ও রুয়ান্ডায় মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটিত হয়েছে এবং এসব দেশের পরিস্থিতির সঙ্গে মিয়ানমারের পরিস্থিতির অদ্ভুত এক মিল রয়েছে। বসনিয়ায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সার্বরা সংখ্যালঘু মুসলমানদের উচ্ছেদ করতে গিয়ে সেখানে গণহত্যা চালিয়েছিল। রুয়ান্ডায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হুতুরা সংখ্যালঘু তুতসিদের উচ্ছেদ করতে গিয়ে সেখানে যে গণহত্যা চালিয়েছিল (১৯৯৪), তাতে মারা গিয়েছিলেন ৫ থেকে ৯ লাখ মানুষ। জাতিগত উচ্ছেদ অভিযান সংঘটিত হয়েছিল সুদানের দারফুরেও। যে প্রক্রিয়ায় এসব দেশে জাতিগত উচ্ছেদ অভিযান পরিচালিত হয়েছিল, তা অনুসরণ করা হয়েছে মিয়ানমারে- ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া, প্রকাশ্যে হত্যা করা, নারীদের ধর্ষণ করা, লাশ গুম করা অথবা সাগরে ভাসিয়ে দেয়া ইত্যাদি। এসব দেশে গণহত্যার জন্য যারা অভিযুক্ত হয়েছিল, তাদের আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে বিচার হচ্ছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিচার সম্পন্ন হয়েছে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিচার চলমান। সুদানের প্রেসিডেন্ট ওমর আল বসিরও এই বিচার এড়াতে পারেননি (দারফুর হত্যাকাণ্ডের জন্য)। পারেননি লাইবেরিয়ার প্রেসিডেন্ট চার্লস টেলরও।

আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত সম্পর্কে যারা খোঁজখবর রাখেন, তারা জানেন পৃথিবীর কোন্ কোন্ দেশে, যেখানে গণহত্যা হয়েছে, এ ধরনের ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়েছে। গণতান্ত্রিক কঙ্গোতে ২০০৪ সালে, কম্বোডিয়ায় ২০০১ সালে এ ধরনের ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই ট্রাইব্যুনাল মানবতাবিরোধী অপরাধে যারা জড়িত তাদের বিচার করেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেই বিচারকার্য এখনও চলছে। আজ মিয়ানমারে যে জাতিগত উচ্ছেদ অভিযান তথা গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে, খোদ জাতিসংঘ একে ‘গণহত্যা’ হিসেবে অভিহিত করেছে। জাতিসংঘের মানবাধিকার সংস্থার শীর্ষ কর্মকর্তা জেইদ রা’দ আল হুসেইন জেনেভায় জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলে দেয়া ভাষণে রোহিঙ্গা হত্যাকাণ্ডকে ‘গণহত্যা’ হিসেবে অভিহিত করে বলেছেন, ‘এই পাশবিকতার ঘটনা পাঠ্যপুস্তকের জন্য ‘জাতিগত নির্মূলের’ একটি উদাহরণ হয়ে থাকবে।’

যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী থিংকট্যাঙ্ক কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশন্সের এক প্রতিবেদনে (Myanmar, Cambodia, and the opportunity for the U.S. Congress, September 07, 2017) বলা হয়েছে, মিয়ানমারের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির ব্যাপারে জাতিসংঘের সিরিয়াসলি কিছু করা উচিত। প্রতিবেদনে সিনেটর ম্যাককেইন এবং কংগ্রেসম্যান এডওয়ার্ড রয়েস অং সান সু চিকে যে সহিংসতা বন্ধে চিঠি লিখেছেন, তা উল্লেখ করা হয়। প্রতিবেদনে মিয়ানমারে সব ধরনের সামরিক সহযোগিতা ও প্রশিক্ষণ বন্ধ এবং একইসঙ্গে কংগ্রেসে রোহিঙ্গা প্রশ্নে একটি শুনানি আয়োজন করার আহ্বান জানানো হয়। রোহিঙ্গাদের যখন ঢল নামছে তখন বাংলাদেশ প্রস্তাব করেছে রোহিঙ্গাদের জন্য আরাকানে একটি 'সেভ জোন' বা নিরাপদ অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করার, যেখানে শান্তিরক্ষা বাহিনী (জাতিসংঘ) রোহিঙ্গাদের নিরাপত্তা দেবে। প্রধানমন্ত্রী গত ১১ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশে নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত সোফি অবার্তকে বলেছেন, রোহিঙ্গাদের নিজ বাসভূমে ফেরাতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের চাপ সৃষ্টি করা উচিত। আর রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিয়ে নাগরিকত্ব দিয়ে নিরাপদে নিজ দেশে বসবাস করার সুযোগ করে দিতে মিয়ানমারের ওপর কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগের একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে গত ১১ সেপ্টেম্বর। তবে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যটি করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাহমুদ আলী। তিনি মিয়ানমারে রোহিঙ্গা নির্যাতনকে 'গণহত্যা' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। সরকারের একজন শীর্ষ মন্ত্রী যখন 'গণহত্যার' কথা বলেন, তখন ধরে নিতে হবে এটাই সরকারি ব্যাখ্যা এবং সরকারি অবস্থান। তাহলে সরকার এখন এই বিপুলসংখ্যক রোহিঙ্গা শরণার্থীকে নিয়ে কী করবে? এটা সত্য, রোহিঙ্গা প্রশ্নে আঞ্চলিক শক্তিগুলো- চীন ও ভারত মিয়ানমারের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। তাদের জাতীয় স্বার্থের আলোকেই তারা এ অবস্থান নিয়েছে। আগামী মাসে ভারত সফরে যাচ্ছেন মিয়ানমারের সেনাপ্রধান সিনিয়র জেনারেল মিন আউং হ্লেআইং। রোহিঙ্গা প্রশ্নে মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর ভূমিকা যেখানে সারা বিশ্বে সমালোচিত, সেখানে দেশটির সেনাপ্রধানকে আমন্ত্রণ জানিয়ে ভারত পরোক্ষভাবে মিয়ানমারের সেনাবাহিনীকে সমর্থন করল বৈকি! অথচ এ ধরনের পরিস্থিতিতে মিয়ানমারের সেনাপ্রধানের ভারত সফর 'স্বাগিত' রাখাটাই ছিল কাম্য। বিশেষ করে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের নীতিনির্ধারকরা এ ধরনের একটি সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন। কিন্তু তারা তা করেননি। মিয়ানমার সরকারকে রোহিঙ্গা প্রশ্নে প্রকারান্তরে ভারতের সমর্থন বাংলাদেশে ভারতের ভূমিকাকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে।

প্রতিটি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে রোহিঙ্গা নির্যাতনের ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সামাজিক গণমাধ্যমে রোহিঙ্গা গণহত্যার যেসব চিত্র প্রকাশ পেয়েছে, তা সিরিয়ায় ইসলামিক স্টেটের জঙ্গিদের সহিংসতাকেও ছাড়িয়ে গেছে। গলা কেটে হত্যা, শিশু ও মহিলাদের অঙ্গহানি, রোহিঙ্গাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়া, প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করা- এসব অপরাধ বসনিয়ার সার্বরাও করেনি। আইএস জঙ্গিদেরও এত সহিংস হতে দেখা যায়নি।

কোনো কোনো বিশ্লেষক বলার চেষ্টা করেছেন, ঐতিহাসিকভাবেই বর্মী নাগরিকরা (আমাদের দেশে একসময় যারা ‘মগ’ নামে পরিচিত ছিল) পৈশাচিক ও বর্বর। ‘গলা কেটে হত্যা করা’ তাদের পক্ষেই সম্ভব। এখন মিয়ানমারের আরাকানে যে সহিংস ঘটনা ঘটেছে, তা ‘জাতিগত উচ্ছেদ অভিযান’, ‘গণহত্যা’, ‘নিরীহ নাগরিকদের ওপর সশস্ত্র হামলা’, ‘নিপীড়ন’, ‘অত্যাচার’ এবং ‘যুদ্ধের মতো পরিস্থিতির’ সঙ্গে তুল্য। সুতরাং মিয়ানমারে রোহিঙ্গা মুসলমানদের হত্যার সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের চিহ্নিত করে বিচারের মুখোমুখি দাঁড় করাতে হবে। সরকারের মূল ব্যক্তি হিসেবে অং সান সু চি তার দায় এড়াতে পারেন না। তিনি হয়তো সরাসরি নির্দেশ দেননি, কিন্তু গণহত্যা বন্ধের কোনো উদ্যোগও তিনি নেননি। তিনিও সমান অপরাধী। একই অপরাধে তিনিও দোষী। তাকেও বিচারের মুখোমুখি দাঁড় করাতে হবে। এজন্য মিয়ানমারের গণহত্যার জন্য একটি আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত গঠন করতে হবে। আদালত অতি দ্রুত একটি তথ্যানুসন্ধান টিম গঠন করে আরাকানে পাঠাবেন। বাংলাদেশে আসা রোহিঙ্গাদের সঙ্গে তারা কথা বলবেন। এক্ষেত্রে লিবিয়ার মতো বিমান হামলা চালিয়ে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী ও উগ্রপন্থী বৌদ্ধদের আরাকানে তাদের হত্যাযজ্ঞ হয়তো বন্ধ করা যাবে না। তবে সেখানে ‘কেনিয়া মডেল’ অনুসরণ করা যেতে পারে। আঞ্চলিক শক্তিকে (এ ক্ষেত্রে আসিয়ানকে) কাজে লাগিয়েও সেখানে (আরাকানে) স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে কী হবে বলা মুশকিল। গত ১৩ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে রোহিঙ্গা প্রশ্নটি আলোচিত হয়েছে। কিন্তু সেখানে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। কারণ জানা গিয়েছিল, চীন ও রাশিয়া মিয়ানমারের বিরুদ্ধে যে কোনো ‘শান্তি’ গ্রহণের বিপক্ষে। চীনের বিশাল বিনিয়োগ রয়েছে মিয়ানমারে, বিশেষ করে আরাকান রাজ্যে। সেখানে গভীর সমুদ্রে আবিষ্কৃত হওয়া গ্যাস চীন পাইপ লাইনযোগে নিয়ে যাচ্ছে কুনমিংয়ে। সেই সঙ্গে আছে তেলের পাইপলাইনও। বিনিয়োগ আছে ভারতেরও। এখন চীন যদি রোহিঙ্গা প্রশ্নে সরকারবিরোধী অবস্থান নেয়, তাহলে এই বিনিয়োগ বাধাগ্রস্ত হবে। যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান সরাসরি

চীনের পক্ষে না থাকলেও যুক্তরাষ্ট্র মিয়ানমারের বিরুদ্ধে কঠোর কর্মসূচি (যেমন অর্থনৈতিক অবরোধ) আরোপের বিরুদ্ধে। বৃহৎ শক্তির এই ভূমিকা বাংলাদেশের অবস্থানকে দুর্বল করেছে। বাংলাদেশের সামনে বিপুলসংখ্যক রোহিঙ্গা শরণার্থীর ভার বহন করা ছাড়া বিকল্প কিছু নেই। জাতিসংঘও মানবতা রক্ষার নামে তার নিজের উদ্ভাবিত আরটুপি তত্ত্ব প্রয়োগ করতে পারবে না। কারণ জাতিসংঘ জিম্মি হয়ে আছে বৃহৎ শক্তির স্বার্থের কাছে। মিয়ানমারের এই গণহত্যা, আর গণহত্যার কাহিনী কাগজে-কলমেই থেকে যাবে।

ডালাস, যুক্তরাষ্ট্র থেকে

ড. তারেক শামসুর রেহমান

প্রফেসর ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক